**সায়নীর স্বপ্ন**

**সাত**

সায়নী খুব প্রানবন্ত।

সবসময় চোখে থাকে উচ্ছ্বলতা, মনটা কল্পনায় উদ্বীপ্ত।

কিন্তু তার প্রাণবন্ততার ভেতরে বাস করে একাকীত্ব আর হতাশার এক অন্ধকার জগৎ। যা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যতোই বয়েস বাড়ছে ততই এই হতাশার অনুভূতিগুলি আরো প্রকট হয়ে উঠছে সায়নীর মধ্যে। এখন সে সবই বুঝতে পারে। সেওতো অন্যদের মতোই বাঁচতে চায়। স্বপ্নের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে চায় একটি অনিন্দ্য সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে।

কিন্তু সে পারছেনা একটি স্বাভাবিক সুন্দর জীবন কাটাতে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই সায়নীকে প্রস্তুত থাকতে হয় যে কোন অপ্রত্যাশিত খারাপ কিছুর জন্য। কারন সে একজন অটিস্টিক।

তার আশে পাশের সবাই তাকে অন্যরকম ভাবে দেখে। কেউ প্রান খুলে তার সাথে কথা বলতে চায় না। চারিপাশের প্রকৃতি, গাছ-পালা, জীব-জন্তু সব কিছুই তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে অভিভূত করে। শুধু মানুষদের সান্নিধ্যে এলেই যেন সায়নীর সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। পুরাতন ঢাকার বিশৃঙ্খল রাস্তাগুলির মতো তার আশে পাশের মানুষগুলো যেন তাকে পুরো গ্রাস করছে বলে মনে হচ্ছে। দিন দিন যেন তার অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তার চারপাশের বিশ্ব থেকে সায়নীর সংযোগ যেন ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে একেবারে একা।

স্কুলে, সায়নী তার সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। ওদের সাথে হৈ চৈ করে মনের আনন্দে কথা বলতে চায়। কিন্তু ওরা যে চায় না। যখন স্কুলের মাঠে সহপাঠিরা দৌড়-ঝাঁপ করে, একসাথে হাসে এবং খেলে, সায়নী প্রায়শই নিজেকে পাশে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতো। এক সাথে মজা করার আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি নিয়ে দূর থেকে দেখতো।

একদিনের কথা সায়নীর মনে পড়ে গেল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার মাস দুয়েক পরের ঘটনা।

একদিন লাঞ্চ ব্রেকের সময় সায়নী স্কুলের মাঠের এক পাশে একটা বেঞ্চিতে একা বসেছিল। সে দেখল তার সহপাঠীরা একসাথে খেলছে। হাতে হাত ধরে শক্ত বৃত্ত তৈরি করছে আর আনন্দে নাচার ভঙ্গিতে ঘুরছে। তাদের হাসি বাতাসে এমন এক সুরের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছিলো যা সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। সায়নীর চোখে জল এসে গেলো। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্য সবার থেকে অনেকটা আলাদা।

নিজকে সান্তনা দেওয়ার জন্য সায়নী স্কুলের মাঠটির একটি শান্ত নিরিবিলি স্থানে গিয়ে বসলো যেন সহপাঠিদেরকে দেখতে না পায়। সে তার চোখ বন্ধ করে তার কল্পনার জগতে আশ্রয় খুঁজে। তার মনকে সান্তনা দেয়। কিছুক্ষনের জন্য সে তার মনের চোখে, এই পৃথিবীর পার্থিব ঝামেলার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে পাখির মতো আকাশে উড়তে লাগলো। নিজের অজান্তেই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলো সায়নী।

আরেক দিনের কথাও সায়নীর বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

চমৎকার এক বিকেলের শেষ মুহূর্ত ছিলো সেদিন। দিগন্ত জুড়ে একটি উষ্ণ আভা ছড়িয়ে শহরের উপর সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করলো। মর্জিনা সায়নীকে নিয়ে বাইরে যায়। মাঝে মধ্যে মর্জিনা সায়নীকে বাইরে নিয়ে যায়। এটাও মর্জিনার একটি কাজ। তবে বেশী দুরে নয়। বাড়ীর পাশের দুইটা গলি পার হলেই আরমানিটোলা স্কুলের ঠিক উল্টো দিকের কয়েকটি বাড়ীর পর সায়নীর খালুদের বিশাল বাড়ী। বাড়ীর সামনেই নিজস্ব বিশাল বাগান। বাড়ীর ছাদেও একটি সাঁজানো বাগান আছে। ঐ বাড়ীতে প্রায় সময়ই সায়নী যায়। বাগানে অনেকক্ষন থাকে। মাটিতে বসে বসে পোকা-মাকড়দের সাথে খেলে, ফুলের গাছগুলোকে ঘুরে ফিরে দেখে। কখনো সখনো বিড় বিড় করে কথা বলে। মায়ের আদেশে মর্জিনা প্রায় সময়ই সায়নীকে নিয়ে খালুদের বাসায় নিয়ে আসে।

আজ খালুর বাসায় যাওয়ার সময় আরমানিটোলা স্কুলের মাঠে বেশ হৈ চে হচ্ছিলো। সায়নী গেইটের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লো। স্কুলের ছাত্ররা নানা গ্রুপে খেলছে। কেউ ক্রিকেট, কেউ আবার ফুটবল। আবার এক দল হাত ধরে ধরে খেলছিলো। কি আনন্দময় পরিবেশ সেখানে। সবাইর মুখে কি সুন্দর হাসি। হঠাৎ সায়নীর দুচোখে জল এসে গেলো।

মর্জিনা সায়নীর কষ্ট লক্ষ্য করে আলতো করে তার হাত ধরলো। "ঠিক আছে, আপা। আমরা চলেন বাড়িতে ফিইরা যাই। আজ আর খালুর বাসায় যামু না। দাদীমা আবার চিন্তা করবেন। -রাস্তার হাজারো বিশৃঙ্খলার মধ্যে মর্জিনার কণ্ঠে ছিলো একটি প্রশান্তির সুর।

সায়নী মাথা নাড়ল। এবার আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো।

বাড়ীতে ঢুকেই সায়নী তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় তার রুমে চলে যায়। সোফায় গা এলিয়ে দেয়, তার গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আস্তে আস্তে কান্না জড়িত কন্ঠে বলতে থাকে-“কেন আমি অন্যদের মতো হতে পারি না? কেন আমাকে এত আলাদা লাগছে?" তার কণ্ঠ আবেগে কাঁপছিল।

ঠিক এমন সময় মর্জিনা এসে রুমে ঢুকে। সায়নীর কান্না শুনতে পায়।

মর্জিনা সায়নীর চারপাশে তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে। "আপনি মন খারাপ কইরেন না আপা। আপনি যেভাবে আছেন হেডাই খুব সুন্দর। আপনি আপনার মতোই থাইকেন। এডাই সবচেয়ে ভালো”- মর্জিনা ফিসফিস করে বলল, তার কথাগুলো সায়নীর আহত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির নিয়ে আসে।

-আমি এহন যাই। আমার অনেক কাজ বাকী আছে-ম্যাডামের পরশুদিন আবার বাত দে। বহুত মেহমান আইব। মেলা কাজ-মর্জিনার কন্ঠে তাড়াহুড়ার ভাব।

সায়নী (মুখে দু হাত দিয়ে চেপে চাপা হাসি)-মর্জিনা বুবু, তোমাকে না বলেছি ভূল ভাল ইংরেজী বলো না। তুমি বাংলায় বলো। আমি তোমার সব কথা বুঝতে পারি।

-ওমা, আমি আবার কিডা ভুল কইরলাম।

সায়নী-কথাটা বাত দে না বার্থ ডে মানে জন্ম দিন। তুমি এখন থেকে বাংলাই বলো।

-ঠিক আছে, আপা। আপনি যহন বলছেন তহন বাংলায়ই কইতাম। কিন্তু ম্যাডাম কইছে মাঝে মধ্যে আপনার কাছে দু একটা ইংরাজী শব্দ হিকতে। বাইরের কেউ আইলে যেন কইতে পারি। ওদের বুঝতে হইবো না যে আমি আপনার দেখ ভাল করি। ইংরেজীতে কইলে তহন মাইনষে ভাববে আমি ইস্মার্ট।

-আবার ভূল ভাল! ইস্মার্ট না স্মার্ট-এবার ধমকের সুরে সায়নী মর্জিনাকে শাসায়।-বলতো তুমি কি কি ইংলিশ জানো?

-অনেকগুলা ইংরাজী শব্দ হিখছি। বলতাম আপা?

সায়নী: হে বলো।

মর্জিনা (চোখগুলো একটু বড়ো করে, দুহাতের আঙ্গুলগুলি পেঁছিয়ে ধরে বলতে লাগলো):তা হলে বলি। সহালে কেউ আইলে বলতাম-গুদ মার্নিং, দুপুরের পরে আইলে-গুদ আফতারনুন, সকালের নাস্তাকে-ব্রাকফাস্ত, তুমি কেমন আইছো?-হাউ আরে ইউ?

সায়নী অন্যদিকে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো সোফাতে। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেলো। বা হাতে চোখ মুছতে মুছতে সায়নী হাসতে হাসতে বলে উঠলো-ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে আর বলতে হবে না। তুমি এখন যাও।

মর্জিনা: আপা ঠিক অয় নাই? আমি ত আরো বহুতটা জানি। যেমন ধরেন-

মর্জিনাকে থামিয়ে দিয়ে সায়নী ধমকের সুরে আদেশ দিলো: আর বলতে হবে না। তুমি এখন যাও। আমার পড়াশুনা আছে। আগে একটু দাদীমার কাছে যাবো।

মর্জিনা: দাদীমাত রুমে নাই। নীচের ঘরে। ম্যাডামের লগে আরো দুইতিনজন লোক আইছে। হে জন্যইত আপনারে নিয়া গেছিলাম। ম্যাডাম কইছিলো।

তার পর মর্জিনা চলে যায়।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলো সায়নী বুঝতেও পারেনি। নিজের রুমের আরামদায়ক সোফায় বসেছিলো সায়নী। পাশের টেবিলের লাইটটা মৃদু আলো ছড়াচ্ছিলো। চোখ দুটি কেমন ভেজা ভেজা লাগছে।

আজ বৃহস্পতিবার। কাল-পরশু দুদিন ছুটি। স্কুল নেই। তাই এতো সব ভাবনারা মাথায় কিলবিল করছে।

আজকের সন্ধ্যাটা সায়নীর খুব প্রিয়।

সায়নীর হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে এই বিশেষ সন্ধ্যাটি। এই দিনটি সপ্তাহান্তের আগমনের সূচনা করে। স্কুলের ঝুট-ঝামেলা আর কঠোর নিয়ম থেকে কিছুটা মূল্যবান অবকাশ মেলে। আর পেন্সিল নেই, বই নেই, নোট বুকের ঝামেলা নেই কিংবা চেয়ারে বসে কোন কোন শিক্ষকের চোখ রাঙানী দেখতে হবে না। সম্ভাবনায় পূর্ণ মাত্র দুই দিনের প্রতিশ্রুতি। থাকে অবাধ স্বাধীনতার উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাটা নিজের মতো করে কাটানোর আনন্দটাই একটু অন্যরকম। আনন্দের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে মনে প্রানে। যেন আনন্দময় প্রশান্তির এক পরিপূর্ন অভয়ারণ্য।

হঠাৎ বারান্দা থেকে সুইটির (তোতাপাখির) আওয়াজে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

-সায়নী, গুদ ইভেনিং। কাম তু মি।

সুইটি সায়নীকে ডাকছে। অন্ধকারে চাদরে যখন শহরটি ঢেকে যায়, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু যখন নিভে যায়, পাখিরা যখন দিনের ব্যাস্ততার পর ডানা ঝাপটিয়ে পত পত করে উড়ে নীড়ে ফিরে যায় তখন সায়নীর প্রিয় বন্ধুটি সায়নীর আদর পেতে চায়। সায়নীর হাতে খাবার খেতে চায়। সায়নীর নরম আঙ্গুলের পরশ পেতে পেতে চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চায়। কি অমলীন সখ্যতা এই দুটি ভিন্ন প্রানের মাঝে। মানুষ আর প্রানী হৃদয়ের এমন গভীর বন্ধুত্ব সায়নীকে দিয়েছে দুদন্ডের শান্তি।

সায়নী (উষ্ণ হেসে): আরে সুইটি। ডাকছো কেন। দিনটা তোমার কেমন গেছে?

সুইটি (পালক ফুঁকিয়ে): ওহ, সায়নী। তুমি স্যাড ক্যানো?

সায়নী: আমি স্যাড হলে তুমি বুঝতে পারো বন্ধু?

সুইটি: আমি বুঝি। তুমি মন খারাপ করবে না। তুমি আমার বন্ধু

সায়নী (মাথা নাড়িয়ে): ঠিক বলেছো সুইটি। তুমিই আমাকে বুঝ। তুমিই আমার বন্ধু। তুমি খুব ভালো।

সুইটি (পালক নাড়িয়ে, শব্দ করে): তুমি গান করো প্লিজ

সায়নী(মৃদু হেসে): গান করবো? বুঝছি তোমার এখন বেড টাইম। তুমি খুব কিউট সুইটি। তুমি কি সুন্দর সাউন্ড করো। কিন্তু তোমার মতো আমি সাউন্ড করতে পারি না। উইল ইউ টিচ মী? প্লিজ।

সুইটি (সায়নীর হাতের দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে, মাথা এদিক সেদিক ঘুরাতে লাগলো) নো, তুমি আমার বন্ধু। তোমার সাউন্ড নো নিড। তুমি আমার সাথে থাকো। আমি খুশী।

সায়নী এবার সুইটির কাছে এসে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সায়নী সুইটিকে খাইয়ে দিলো। ছোট ছোট দেশী কলা, কলার খোসা কিশমিশ আর নাট সুইটির খুব পছন্দ। সুইটির খাঁচার পাশেই ওর প্রিয় খাবারগুলো রেখে যায় মর্জিনা নিয়মিত।

বেশ কিছুক্ষন সুইটির সাথে থাকার পর সায়নী রুমে ফিরে আসে।

এখনো সাতটা বাজতে অনেক বাকী আছে।

ঠিক সাতটার সময় মর্জিনা সায়নীকে খাওয়ার জন্য ডাকবে। দাদীমার সাথে সায়নী প্রতিদিনই ঠিক সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে খাওয়া শেষ করবে। তার পর সায়নী পড়তে বসে। একটানা সাড়ে নটা পর্যন্ত পড়াশুনা করবে। বাবা অনেক রাত করে আসবে। ইদানীং বাবার সাথে দেখা হয় না বললেই চলে। মাও প্রায় সন্ধ্যাই বাইরে যায়। তমালকে দাদীমাই দেখেন। তাছাড়া তমালকে সবসময় দেখাশুনার জন্য একজন কাজের মেয়ে আছে। খুব বিশ্বস্ত রোকেয়া মেয়েটি। বাবার গ্রাম থেকেই নিয়ে এসেছে। রোকেয়ারা খুব গরীব। তমাল জন্মের পর থেকেই রোকেয়া এই বাড়ীতে আছে। মাঝে মধ্যে সায়নীর সাথে গল্প করতে ছাদে বা তিন তলার সীটিং রুমে আসে। রোকেয়া কখনো সখনো সায়নীর চুল আছড়িয়ে সুন্দর করে দুপাশে বেনী বেঁধে দেয়। সায়নীও রোকেয়াকে খুব পছন্দ করে।

সায়নী ড্রইং করতে খুব পছন্দ করে। তাঁর হৃদয় থাকে স্বপ্নে পূর্ণ এবং ড্রইং প্রতি তার আছে বিশেষ অনুরাগ। ড্রইং করতে বসলেই এক আনন্দের আভা তার চোখে মুখে ধরা দেয়। তার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে।

খুব ছোট কাল থেকেই সায়নী তার আঁকার মধ্যে সান্ত্বনা এবং আনন্দ খুঁজে পেতো। খালুর বাগানের ফুলের প্রাণবন্ত রঙের স্কেচ বা বাঙালি গ্রামাঞ্চলের মহিমান্বিত সৌন্দর্যকে ধারণ করাই হোক না কেন, শিল্পই যেন ছিল তার অভয়ারণ্য। ঢাকার মতো জনাকীর্ণ শহরের ব্যাতি ব্যস্ত জীবনের বিশৃংঙ্খলা আর জনাকীর্ন অলি-গলীর বহুমূখী চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থাপন করার মধ্যে খুঁজে পায় পরম শান্তি। আর তাইতো সায়নী যখন অংকন করতে বসে তখন সে তার পেন্সিলের স্ট্রোক এবং পেইন্টব্রাশের আঁকা-ঝুকিতে নিজকে ধ্যান-মগ্ন করে রাখে।

প্রায় দিনই স্কুলের পরে, সায়নী তার রুমে ঢুকেই দেয়ালে প্লাস্টার করা তার স্কেচ দিয়ে সজ্জিত রুমটিকে কিছুক্ষন খুব গভীর ভাবে দেখে আর পুলকিত হয়। তারপর কিছুক্ষনের জন্য ড্রইং করতে বসে। তার পেন্সিলের প্রতিটি স্কেচে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে সময়টুকুর জন্য কল্পনার জগতে। সে কিছুটা সময়ের জন্য সায়নী যেন ঢাকার এই পুরাতন শহরের ধুলা-বালি আর অজস্র বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পায়। এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করে যেখানে সে সীমানা ছাড়াই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

অথচ তার এই অংকনের প্রতিভা পরিবারের কারোই নজরে পড়েনি, একমাত্র দাদীমা আর মর্জিনা ছাড়া। দাদীমাই সায়নীর আঁকা একটি ড্রইং সায়নীর বাবা-মাকে দেখিয়েছিলো একদিন। পরিবারের সবাই তার সৃষ্টি দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিল।

আনন্দে সেদিন বাবা বলেছিলো-বাহ্, এতো সুন্দর ড্রইং। তুমি একদিন বড়ো আর্টিষ্ট হবে। কিন্তু সায়নীর জন্য, শিল্পে ছিল তার জীবনরেখা যা তাকে বিশুদ্ধ সুখ এনে দিয়েছে।

সায়নীর মনে আছে স্কুলের সেই দিনটার কথা যেদিন আর্ট ক্লাশের শিক্ষক ঘোষনা দিয়েছিলেন যে নেকস্ট উইকে ক্লাশে প্রতিযোগীতা হবে। থিম হবে "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"। খুব খুশি হয়েছিলো সায়নী সেদিন। মনে মনে সংকল্প নেয় প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করবে। সে জানতো সে অংকনে খুব ভালো করবে। তাই সেদিন থেকেই অটল সংকল্পের সাথে শিল্পকর্মে তার হৃদয় এবং আত্মা ঢেলে দিয়েছিলো। প্রতিযোগিতার দিন আসার সাথে সাথে সায়নীর হৃদয় উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে কেঁপে উঠল। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ নদী বিধৌত গ্রাম বাংলার ছবি চিত্রিত করে সায়নী। কোলাহলপূর্ণ গ্রামের বাজার থেকে নদী তীরবর্তী গ্রাম পর্যন্ত।

যখন বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, সায়নী বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার নামই প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে ডাকা হয়েছিল। আনন্দের অশ্রু তার গাল বেয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো যখন সে তার পুরস্কার গ্রহণ করছিল শিক্ষকের কাছ থেকে।

সায়নী টিভি খুব কম দেখে। অবসর সময়ের বেশীর ভাগটাই কাটায় আর্টে কিংবা দাদীমার কাছে।

তবে কখনো সখনো টিভিতে এনিম্যাল ওয়াল্ড দেখতে পছন্দ করে। ভিডিও গেইমস ও খেলে। বাবা সিংগাপুর থেকে এক্স বক্স নিয়ে এসেছিলো। সব ভিডিও গেইমসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের খেলাটি হলো মাইনক্রাফ্ট। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনদিন এই খেলাটি সায়নীর খেলা চাই।

নানা কারনে এই খেলাটি সায়নীর খুব ভালো লাগে। মাইনক্রাফ্ট খেলতে গেলে সায়নীর চিন্তা শক্তি যেন বেড়ে যায়। নতুন নতুন জিনিস তৈরী করতে সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে। আর নতুন জিনিস অন্বেষণে সায়নী সবসময় উৎসাহিত হয়। । মাইনক্রাফ্টের এই খেলাগুলো সায়নীর কাছে একটা এডভাঞ্চেরের মতো মনে হয়।

মাইনক্রাফ্ট খেলে খেলে সায়নী অনেক কিছু শিখেছে। মেন্টাল ম্যাথসের অনেক কিছু জেনেছে এই ভিডিও গেইমসের মাধ্যমে। মাঝে মধ্যে দাদীমাকে নিয়ে আসে। এক সাথে খেলে। তবে দাদীমা খেলার চেয়ে খেলা দেখতে খুব পছন্দ করে। সায়নীর পাশে বসে বসে অনেকক্ষন খেলা দেখে।

টিভিতে সায়নীর খুব অসুবিধা হয়। তাছাড়া টিভিটা তিন তলার সিটিং রুমে। দাদীমার খুব পছন্দের বাংলা সিরিয়াল নিয়ে বেশীর ভাগ সময় বসে থাকেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মর্জিনাও এসে বসে। গভীর মনযোগ দিয়ে দুজনেই টিভিতে সিরিয়াল দেখে। টিভির স্ক্রীন থেকে চোখ আর সরাতে পারে না। মাঝে মাঝে দাদীমা রাগে চীৎকর করে উঠে। মর্জিনাও তখন যোগ দেয়।

যেদিনই সায়নী টিভি দেখে সেদিনই ওর মাথা ব্যাথা করবে কিংবা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। ভাবনারা কেমন বিশৃংঙ্খল হয়ে যায়, উদ্বেগ বেড়ে যায়, পড়াশুনায় মনোযোগ কমে যায়।

এক সময় বিশেষ করে ছুটির দিনে সায়নী বেশ টিভি দেখতো। ওর মেজাজ তখন প্রায় সময়ই খিটখিটে থাকতো। ঠিক সময়ে খেতে চেতো না। প্রায় সময়ই রাগ করতো। চীৎকার চেচামেচি করতো। একদিন সায়নীর বাবা সায়নীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তার উপদেশ দিলেন সায়নী যেন বেশীক্ষন টিভি না দেখে। অটিজমের কারনে বেশীক্ষন টিভি দেখায় ভাবনায় অস্থিরতা বাড়াতে পাড়ে। সেদিন থেকে সায়নী প্রায় টিভিতে কোন প্রোগ্রাম দেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে বলা যায়।

এক সময় মর্জিনা এসে সায়নীর রুমে ঢুকে।

সায়নী মর্জিনার সাথে বেড়িয়ে যায় দাদীমার সাথে খাবে বলে। বারান্দা থেকে সুইটির আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেলো না। বাড়ন্ত রাতের নিস্তব্দতায় সুইটিও নিজকে ডুবিয়ে দিয়েছে ঘুমের ঘোরে।

**চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট